শিশুর মনোজগত

আঠারর কম বয়সী সবাইকে শিশু বলা হয়। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে শিশুর মনোজগত বলতে শিশু-কিশোরদের মনের জগতকে বোঝানো হচ্ছে। অভিভাবকেরা অনেক সময় মনে করেন যে, ছোটরা কিছু বুঝেনা। তাদের ভালর জন্য অবিভাবকেরা যা বলবেন বা করবেন তাই তারা মেনে নিবে। এতে তাদেরই কল্যাণ হবে। প্রশ্ন হলো আসলেই কি ব্যাপারটা এমন? ভাল কাকে বলে? বাবা-মা যা বলছেন তাই কি ভাল, না শিশু-কিশোরদের কাছে অন্য কোন বিষয়কে ভাল বলে মনে হতে পারে।

মানব শিশু এক বিস্ময়! ছোট্ট বাচ্চাটি ধীরে ধীরে নির্ধারিত গতিতে বিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষে পরিণত হয়। প্রকৃতির নিয়মে তার দেহ বাড়ে। দেহের সাথে বিস্ময়কর মস্তিষ্কটিও বাড়ে। এর মধ্যে থাকে মানুষের সফটওয়্যার। বাড়ে বুদ্ধি, বিবেক, ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, সামাজিকতা। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকতার বিকাশ কিন্ত একদিনে হয়না। ক্রমাণ্বয়ে ধীরে ধীরে হয়। ছোট শিশুর চিন্তা, তের বছরের কিশোরটির চিন্তা ও একুশ বছরের যুবকের চিন্তা একরকম হয়না। আবার মানুষে মানুষে বিকাশের তারতম্য হয়ে থাকে। কেউ দ্রুত পরিপক্কতা অর্জন করে, কারো একটু সময় লাগে। শিশুর সাথে কথা বলতে গেলে বা মতবিনিময় করতে গেলে তার বিকাশের স্তরটি লক্ষ্য রাখা দরকার।

আমরা অনেক সময় মনে করি শিশুরা এবিষয়টি বুঝবেনা। এক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ তার বিকাশের স্তরটি লক্ষ্য করা। এমনও হতে পারে সে দিব্যি বুঝছে, কিন্তু আমরা ভাবছি যে সে বুঝেনা। তার স্তরে নেমে তার মতো করে বিষয়টি বুঝিয়ে বললে আমরা বুঝতে পারবো আসলে সে বেশ বুঝতে পারে।

বড়রা যখন শিশুর মতামত অগ্রাহ্য করে, তার যে ভাবার ক্ষমতা আছে এবিষয়টিই তারা বুঝতে পারেনা । তারা শিশুর উপর নানা বিষয় চাপিয়ে দিতে থাকে, তাকে এগুলো মানতে বাধ্য করতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে। তখন শিশু-কিশোরদের সাথে বড়দের মনোমালিন্য হয়, তৈরী হয় দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝি। বড়রা শিশু-কিশোরদেও বেয়াদব ও অবাধ্য ভাবেন। অন্যদিকে শিশু-কিশোরেরা বড়দের একনায়ক ও অত্যাচারী, জুলুমবাজ মনে করে। বিশেষতঃ কিশোর বয়সটাই এমন যে বড়দের সাথে গোলমাল হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ফটিক পড়া থাকলে বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়। ফটিক এতটাই উল্টো-পাল্টা চালচলন করতো যে, মা ছাড়া কারো পক্ষেই তা মানা সম্ভব ছিলনা। ফটিক যদি বেঁচে থাকতো ও বড় হতো তখন তার মধ্যে আবেগীয়, সামাজিক, জ্ঞানীয় ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটতো। ফলে সে আর এতটা বাড়াবাড়ি করতোনা। কিশোর বয়সটা বিদ্রোহের বয়স। কিাশোর-কিশোরীরা বড়দের মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে, অন্যদিকে নিজেদের মূল্যবোধও পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। তারা সমবয়সীদের দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয়। বাবা-মার তুলনায় তাদের কথাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। এই বয়সে

তারা আবেগে ভাসতে থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিকাশটি তখনও পূর্ণঙ্গতা পায়নি। তাদের চিন্তা ক্ষমতা ও বিবেচনাবোধও কম থাকে। ফলে বড়দের সাথে খুব লাগতে থাকে।

শিশু কিশোরদের উপর অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করলে তাদের মানসিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। তারা ধীরে ধীরে একগুয়ে হয়ে উঠতে পারে, এমনকি আরো বেশী করে অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে, তাদের মধ্যে ভাঙচুরের মতো বিধ্বংসী প্রবণতা তৈরী হতে পারে এমনকি তারা বড়দের গায়ে হাত তোলার পর্যায়েও চলে যেতে পারে। অনেক শিশু আবার পরনির্ভরশীল, হতাশাগ্রস্থ, নিম্ন আত্মধারণাসম্পন্ন, অপরাধবোধে আক্রান্ত ও উদ্যোগহীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে। অনেকের মধ্যে এমনকি বেঁচে থাকার প্রতি ও জীবনপথে অগ্রসর হবার মতো কোন আগ্রহই থাকেনা।

নানা কারণেই সমস্যাটি আজকাল আরো জটিল হয়ে উঠছে। আজকাল মানুষের সন্তান সংখ্যা গেছে কমে। এক বা দুটি সন্তান নিচ্ছে মানুষ। বাবা-মায়ের সব স্বপ্ন এই সন্তানকে ঘিরে। নিজে হয়তো মেডিক্যালে পড়তে পরেননানি। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টিরও অনেক মর্যাদা আছে সমাজে। ভাল আয়-রুজি হয় এই পেশায়। জয়নুল আবেদিনের ছবি দেখে ভাল লেগেছে। চিত্রাঙ্কনও শিখাতে হবে। গান গাওয়া, নাচা, জুডো-কারাতে প্র্যাকটিস করা সব কিছুই শেখা দরকার। ওর নানা চান ওকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শিক্ষিত করতে। নিয়মিত ধর্মশিক্ষাও শুরু হলো। বোর্ড পরীক্ষার পর গর্বিত বাবা-মায়ের মাঝখানে মেধাবী বাচ্চার ছবি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়। আমার সোনামনিকেও হতে হবে এমনতর মেধাবী। শুরু হলো কঠিন ভাবে পড়ানো। এক বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন সে পড়ছে? ত্বরিৎ উত্তর এলো বাবাকে খুশী করতে। এত কিছু বাচ্চার জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু কি চায় বাচ্চা? কোথায় হারালো তার শৈশব। টাকার দুনিয়ায়, প্রতিযোগীতার দুনিয়ায় চঞ্চল শৈশব মুখটা ছোট করে মন খারাপ করে কখন বিদায় নিয়েছে কেউ তার খোঁজও রাখেনি। তোতা কাহিনীর তোতার মতো শিশুটি এখন শুধু বই গিলছে আর পরীক্ষার হলে উগড়ে দিচ্ছে। এক্সস্ট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি পড়ালেখার মতোই বোরিং অত্যাচারে পরিণত হয়েছে। মাঠে দৌড়াবে শিশু! হাসালেন বটে। কোথায় মাঠ? আর কেনই বা আমার বাচ্চা দৌড়াবে? সে বরং পড়বে। তার গাড়ি আছে। দৌড়ানোর প্রয়োজনই নেই। একসময় দুষ্ট বাচ্চা ছিল। বড় হয়ে তাদের অনেকেই ভাল হয়ে গেছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত দায়ীত্বশীল মানুষে পরিণত হয়েছে। এখন একটু দুষ্টুমি করলেই হলো তাকে মানসিক চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। লেখাপড়ায় ফাঁকি মারলেও রক্ষা নেই। মানসিক চিকিৎসা অপেক্ষা করছে।

সারাক্ষণ বাবা-মায়ের চোখের সামনে কয়েক শত স্কয়ার ফিটের মধ্যে থাকে শিশু (কিশোর)। বিনোদন টেলিভিশন, ভিডিও গেমস, ইন্টারনেট, সোস্যাল নেটওয়ার্ক ও মোবাইল ফোন। তারা শিখছে- ‘কাছে থাকুন, কিপ ইন টাচ’। কাছের মানুষ কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। জটিল নেটওয়ার্কেও ভিতরে, ধরা ছোয়ার বাইরে, ছায়া ছায়া কতগুলো অস্তিত্ব, এরাই তার ফ্রেইন্ড। গভীর রাত্রে মোবাইলে চলে আলাপ-চারিতা- একদম বল্গাহীন ভাবে।

অভিভাবকেরা বলে এটা বন্ধ কর। কি করবে সে? শুধু পড়বে, বাবা-মায়ের জীবনের বঞ্চনা ঘোচানোর জন্য, তাদের মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য হয়ে উঠবে হরলিক্স বয়? - যে একজন অলরাউন্ডার। সব কিছু করে নিমেষেই ও কখনো ক্লান্ত হয়। সব সময় সুখী ও সফল। ক্লান্ত হলে একটু হরলিক্স খেয়ে নেয় শুধু।

কি হচ্ছে এসব? যেন একদম গোড়ায় গলদ। একটু ভেবে দেখা দরকার নতুন করে। আমার শিশুটি আসলে কি চায়। কি আছে তার ছোট্ট মাথার ভিতর। আমি কি তাকে সাহায্য করছি? না তার বিকাশকে দারুণ ভাবে বাধা দিচ্ছি?

শিশু-কিশোরদের বিকাশ নিশ্চিতকল্পে নিচের পদক্ষেপগুলো বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি-

- শিশুকে কেন্দ্র করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার মত জানতে চান ও স্বক্রিয় বিবেচনায় নিন।
- আপনার সিদ্ধান্তটি তাকে জানান ও কেন এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করুন।
- তাদের পর্যাপ্ত শারীরিক খেলাধুলা নিশ্চিত করুন। সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে দৈনিক অন্ততঃ এক ঘন্টা খেলতে দিলে ভাল হয়।
- শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য উদ্যোগ নিন। তার পুষ্টি নিশ্চিত করুন। তার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করুন।
- শিশুর আবেগীয় সমর্থন নিশ্চিত করুন। সে বেড়ে উঠুক আদরে আর ভালবাসায়।
- শিশুকে মারবেননা বা ভয় দেখাবেননা।
- অতিরিক্ত পড়ার চাপ দিবেননা। সব বাচ্চা একসাথে প্রথম হতে পারেনা। সবার সামর্থ্যও সমান হয়না।
- তাকে কোন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করালে, যেমন, গান শেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি করালে তার মত আছে কিনা তা জেনে সেই অনুসারে করান।
- শিশু কোন বিষয়ে পড়বে তা তার আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে, তার সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে এবং শিক্ষকের মতামত নিয়ে নির্ধারণ করুন। মনে রাখবেন, আপনার স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার সে নয়।
- শিশুকে স্বনির্ভর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন। তার সব কাজ আপনি করে দিবেননা। বরং সে যাতে নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে, নিজের কাপড় ধুতে পারে, সাধারণ রান্ন-বান্না করতে পারে, অসুস্থ হলে কি করতে হবে তার সাধারণ জ্ঞান তার জানা থাকে, সামাজিক হয় ও সামাজিক দক্ষতা তার থাকে, শারীরিক ভাবে কষ্টসহিষ্ণু হয়, আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে, আবেগ যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে শিখে তার শিক্ষা দিন।
- পারিবারিক শৃঙ্খলা একই ভাবে সবাই মিলে বাস্তবায়ণ করুন।
- পরিবারের সবাই সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলার অভ্যাস করুন।
- ভাল আচরণ বা কাজকে উৎসাহিত করুন। প্রশংসা করুন ও পুরষ্কৃত করুন।

- খারাপ আচরণ বা কাজকে অগ্রাহ্য করুন। চেষ্টা করুন একদম লক্ষ্য না করতে।
- খুব খারাপ ধরণের আচরণ করলে এটা যে আপনি মানতে প্রস্তুত নন এটা বাচ্চাকে বুঝিয়ে বলুন। কারণগুলো তার বোঝার মতো করে বলুন। তাকে একবার সতর্ক করুন ও এটা আবার করলে তাকে কিছুক্ষণ কোথাও চুপচাপ বসিয়ে রাখুন। এসময়ে নিশ্চিত করুন যাতে সে কোন ধরণের ভয় না পায় এবং কোন ভাবেই মজা না পায়। পরে দুঃখ প্রকাশ করে সে এখান থেকে ছাড়া পাবে। শাস্তি হিসাবে তার পছন্দের কোন একটি জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন। যেমন, এদিনের মতো কার্টুন দেখা বন্ধ।

আসুন আমাদের ভালোবাসা বাচ্চার বিকাশের পক্ষে অন্তরায় না হয়ে বরং পাথেয় হয় তা নিশ্চিত করি। পরিবার, স্কুল ও রাষ্ট্র সবারই কিছু না কিছু করার আছে আগামী প্রজন্মের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।